কালো চামড়া কোন মুখোশ
মূলঃ দাম্বুদজো মারেচেরা
অনুবাদঃ এলহাম হোসেন

[দাম্বুদজো মারেচেরার জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ঠা জুন জিম্বাবুয়েতে। তখন এর নাম ছিল দক্ষিণ রোডেশিয়া। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, নাট্যকার ও কবি। সংক্ষিপ্ত ক্যারিয়ারে লিখেছেন একটা গল্পের বই, দু'টি উপন্যাস যার একটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, একটি নাটক, গদ্য ও কবিতার বই। একটি কাব্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। তিনি ১৯৮৭ সালের ১৮ই আগস্টে মৃত্যুবরণ করেন। এই গল্পটি তার বিখ্যাত 'Black Skin What Mask'-এর বাংলা অনুবাদ।] অনুবাদক

আমার চামড়া প্রচন্ড রকমেই দৃশ্যমান আমার চারপাশের মাইল খানেক পর্যন্ত জনসমুদ্রে। প্রত্যেকবার, যখনই আমি বাইরে যাই, মনে হয় এটি ঘাবড়ে যাচ্ছে, শক্ত হয়ে উঠছে, নিজেকে খোঁচাচ্ছে। যখন ছাদের নীচে থাকি, একা থাকি, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি, যান্ত্রিক কর্ম সাধন করি, এবং বেশ অদ্ভুতভাবে যখন রাগান্বিত থাকি কেবল তখনই এটি স্বস্তিতে থাকে। কিন্তু এটি লজ্জায় কুঁকড়ে যায় এবং আত্মসচেতন হয়ে ওঠে যখন আমি চেয়ারে বসে লিখতে শুরু করি।

এটি এক নিরব বন্ধুর মতো – মেজাজী, ঠোঁট কাটা, আত্মভিলাষি, আবার কখনও এলোমেলো। আমার এক সময় এরকম একজন বন্ধু ছিল। সে শেষ পর্যন্ত তার হাতের কবজি কেটে ফেলেছিল। এখন সে পাগলাগারদে। আমি তখন থেকেই নিজেকে প্রশ্ন করে চলেছি– কেন সে ঐ কাজটি করেছিল, কিন্তু আজও শেষ উত্তরটুকু পাইনি।

সে সবসময়ই গাত্র স্নান করত – দিনে কমপক্ষে তিনবার। ওটা তাকে পেয়ে বসেছিল । ওকে পরিতুষ্ট করার জন্য তার সব ধরনের লোশন ও ডিওডোরেন্ট ছিল। সে নিজেকে ঘষত রক্ত বেরিয়ে পড়া পর্যন্ত।

ইংরেজি ভাষার উন্নতি করে এবং এর উচ্চারনের বিশেষ টান থেকে মুক্ত হয়ে সে তার ভাষাকে ঘষে-মেজে দুরস্ত করার চেষ্টা করত। তার কথা শোনা যেমন বেদনাদায়ক ছিল তেমনি তার চামড়া ঘষে কালো রং তুলে ফেলার কসরৎ দেখাও ছিল কষ্টদায়ক।

সে তার চুলের সাথেও একই কাজ করতো যা মহান ঈশ্বর কখনই চাননি।

সে পোষাক-আশাক কিনেছিল-পুরা দোকানশুদ্ধ। পোষাক যদি কাউকে মানুষ করে তোলে তবে নিশ্চিত সে তা-ই। তার জুতোগুলো এমন যে তা একটা হাতি পরলেও হয়ে উঠবে দ্রুতগামী ও অভিজাত। ঐ জুতোগুলো তৈরী করতে যে প্রাণীগুলোকে হত্যা করা হয়েছে তারা যেন কবর থেকে বলে– হ্যাঁ ঠিক আছে, ম্যান।

কিন্তু তবুও সে অসন্তুষ্ট। তার চার পাশের দশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি আফ্রিকীর একই অবস্থা। মোটের উপর, যদি একটা শিম্পাঞ্জী শুধু চা পান করতে না শিখে যদি টেলিভিশনে তার পক্ষে ওকালাতও করতে পারে, তবে লাভ কি যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট সব শিম্পাঞ্জী আচড়কেটে কেটে মাছি ধরে আর লেজের সাথে দোল খায় আর রোদ্‌স আর কলা বলে বলে কিচিরমিচির করতে থাকে।

যাই হোক, একদিন সে বেশ ভালো কাজ করলো এটা আমার দিকে আঁড়াআঁড়িভাবে রেখে। আমরা অক্সফোর্ড টাউন হলে নববর্ষের নৃত্যানুষ্ঠানে যাচ্ছিলাম।

"তুমি কি কখনও তোমার জিন্স পাল্টাও না?" সে জানতে চাইল।

"এগুলোই আমার একমাত্র জিন্‌স," উত্তর দিলাম।

"টাকা দিয়ে কি কর, মদ খাও? "

"হ্যাঁ," পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বললাম। মদ খাই, কাগজ কিনি, কালি কিনি। আমার কাজই এটা।

"তোমার চেহারার যত্ন নেওয়া উচিত, বুঝলে। আমরা শাখামৃগ নই। "

"আমি যা তাতেই ঠিক আছি। " আমি কাশি দিলাম আর যেহেতু সে জানতো সেই কাশির অর্থ তাই সে ঘাবড়ে গেল, যেন সে ঘুসি খেয়েছে।

"তোমার কাছে যদি পয়সা-কড়ি থাকে," আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, " তবে আমাকে একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট ধার দাও। " সেদিন সে আমার মতোই সমানে সমানে দৃঢ় ছিল।

" ধার দিবেও না, ধার নিবেও না," সে উদ্ধৃতি দিল। তারপর একটু ভেবে বলল:

"আমরা একই আকারের। অন্য স্যুটটা পড়ে নাও। ভাল লাগলে একেবারে নিয়েও নিতে পারো। সাথে পাঁচ পাউন্ড। "

এভাবেই সে আমাকে এটা দিলো। এটি এরকম যতক্ষণ না সে তার হাতের কবজিতে সজোরে আঘাত করল। কিন্তু ওটা ছাড়াও ওখানে আরও ব্যাপার ছিল।

চেহারাই কেবল–যতই ব্যয় বহুল হোক না কেন–সান্দিহান চড়াই উৎড়ানো বুটের মতো যখন কেউ সামাজিক অভিযানের ঢালু পিচ্ছিল পথকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। যখনই মুখ খুলতো তখনই নিজেকে হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করতো। **সেটাতো তার কাছে ছিল যাদুর উক্তি**। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে সে জিনিসটাও আফ্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণন করা মোটা চামড়ার নৃবিজ্ঞানীকেও বিরক্ত করে ছাড়বে। আমি প্রথমেই আগ্রহী ছিলাম মদ্য পানে, তারপর সঙ্গ গ্রহণে। কিন্তু সে, ঈশ্বর সহায় হোন, প্রথমেই আগ্রহী ছিল মানুষের সাথে খাপ খাওয়ানোর রাজনীতিতে। কিন্তু কে এমন সঙ্গের সাথে রোডেশিয়ার ব্যাপারে মন ভালো রাখতে পারে। সে এটা কখনও বুঝতেই পারল না।

আর ও যিশু ! যখন ও নাচতে শুরু করতো তখন ওকে একটা বানরের মতো দেখাতো। সে সবসময়ই ভাবতো যে, কোনো মেয়ে যদি তার সাথে নাচার অনুরোধ গ্রহণ করে, তাহলে তার মানে দাঁড়ায় যে সে সায় দিয়েছে যে, তার শরীরের যত্রতত্র হাত দেওয়া হবে, দোমড়ানো মোচড়ানো হবে, চুমু খাওয়া

হবে এবং সবশেষে তাকে ঘুরাতে ঘুরাতে মেঝের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। আর মেয়েরা তার প্রতি বেশ নির্দয়। ডাক-হাক বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবকিছু সুনসান নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।

কি ধরনের মেয়েরা তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় সে ব্যাপারে আমি পরোয়া করি না। সে চায় তারা হবে শক্ত, চটপটে, লাজুক এবং একই রকমের আলাপচারিতা :

" তোমার কলেজ?"

" —— তোমার টা ? ঃ

" —— ।"

একটু থেমে,

" তোমার বিষয় ? "

" —— তোমার বিষয় ? "

থামবে। কাশি দেবে।

" আমি জিম্বাবুয়ে থেকে এসেছি। "

" সেটা আবার কি?"

" রোডেশিয়া। "

" ওহ। আমি লন্ডন থেকে। এই, (সুস্পষ্ট আগ্রহ ছাড়াই) স্মিথ একটা জারজ, নয় কি? আগ্রহের সাথে : "অসালে ব্যাপারটা হলো কি, আমি সবে আমার গবেষণায় আফ্রিকি সমাজের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছি আর তখনই ইয়ান স্মিথের .... ইত্যাদি .... ইত্যাদি। "

(হাই তুলে) " মজার। বেশ মজার। "

স্মিথের ছড়া – ইত্যাদি... ইত্যাদি... ইত্যাদি...। (হঠাৎ করে) তুমি কি নাচতে পছন্দ কর ? বিস্মিত:

" বেশ ... আমি ... হ্যা, কেন নয়?"

ওটা এমনই ছিল। হ্যাঁ, ওটা এমনই ছিল যতক্ষণ না সে তার হাতের কবজি গুলোতে আঁড়া আঁড়িভাবে আঘাত করল।

কিন্তু ওটার চেয়ে আরও বেশি।

একরাতে যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-সভার পার্টিতে যাচ্ছিলাম তখন এক ভবঘুরে তাকে জোরালোভাবে সম্বোধন করল। ব্যাপারটা এমন ছিল যেন তাকে কোন কুষ্ঠরোগী স্পর্শ করেছে। আক্ষরিক অর্থেই সে লোকটার কাছ থেকে সরে গেল, যে লোকটা আমাকে ঘটনাক্রমে চিনত পূর্বের সাক্ষাত থেকে যখন আমরা ক্রিসমাস সন্ধ্যায় কারফ্যাক্সে একই টেবিলে এক বোতল হুইসকি খাচ্ছিলাম। সে ছিল অত্যন্ত বিতৃষ্ণা তাড়িত ক্ষ্যাপা আর পার্টিতে সেই কিছুই বলতে পারছিল না:

" কিভাবে একজন কালো চামড়ার মানুষ ইংল্যান্ডে নিজেকে তুচ্ছ হতে দেয়। অনেক কিছুই করার আছে। বিশেষ করে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। যা আমি দেখতে চাই তা হলো ইত্যাদি... ইত্যাদি... ইত্যাদি...।"

“ পান করুন,” আমি বললাম।

সে এটাকে এমনভাবে নিলো যেন ঈশ্বর শয়তানের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন।

“তুমি তো জানো, তুমি অনেক পান কর, “সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। ”

“তুমি তোমার ভালোর জন্যই খুব কম পান কর”, আমি বললাম।

ভবঘুরের ঘটনা তাকে কুঁড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশী কারণ যখন আমরা কলেজে ফিরলাম তখন সে ঘুমাতে পারল না। আর সে আমার রুমে এক বোতল ক্ল্যারেট নিয়ে ঢুকল যা সে সকালের নাস্তার আগ পর্যন্ত সানন্দে পান করে এবং যখন সে অসম্ভব কালো জারজদের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। সে কথা বলা বন্ধ করে কারণ সে তার চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ে।

আর যতক্ষণ না হাতের কব্জিতে আঘাত পায় ততক্ষণ সে এভাবেই থাকে।

কিন্তু গল্পের অন্য দিকগুলোও আছে। উদাহরণ স্বরূপ, সে ভাবতে পারে না যে তার শিক্ষকদের একজন তাঁকে ‘পছন্দ করে।

“তাঁর কাউকে পছন্দ করতে হয় না, ” আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, “এবং তোমারও না ।”

কিন্তু সে আমার কথা শুনছিল না। সে তার আঙ্গুল মটকে বলল:

“ আমি তাঁকে সবচেয়ে দামী ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার কার্ড পাঠাবো। ”

“কেন তুমি ব্লু নানের মদের জন্য টাকা খরচ করছ না?” আমি ঈঙ্গিত করলাম।

যেভাবে সে আমার দিকে তাকালো তাতে মনে হলো আমি একজন বন্ধুকে হারাতে চলেছি। উদাহরণ স্বরূপ, একদিন সে আমাকে বলল, যদি কোন ওয়ার্ডেন বা শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করেন যে সে তার বন্ধু কি-না, সে উত্তর দেবে ‘না’।

“কেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“তুমি তো জানো, তুমি অনেক মদ পান কর,” কঠোর চাহুনি দিয়ে বলল, ”এবং আমার ভয়হয় যে, তুমি অনেক বাজে আচরণ কর। উদাহরণ স্বরূপ, আমি বিয়ার কক্ষের একটা ঘটনা সম্বন্ধে শুনেছি। একটা ঘটনা খাবার ঘরের আর একটা শস্যের বাজারের যেখানে পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। আর একটা তোমার বাড়ির সিড়িতে .....”

আমি হাসলাম।

“ আমি তোমার স্যুট ইস্ত্রি করে তোমার রুমে পাঠিয়ে দেব,” আমি দৃঢ়তার সাথে বললাম, “ আর আমি তো তোমাকে পাঁচ পাউন্ড ফেরতই দিয়েছিলাম। কাজেই সব ঠিক আছে। তুমি কি হলে খাবার খাচ্ছ, কারণ যদি তা কর তবে আমি সেখানে নাই, এটি অসহ্য। কল্পনা কর। এই কলেজে আমরাই দুজন আফ্রিকী। কিভাবে সম্ভব একে অপরকে এড়িয়ে চলা বা সেই ব্যাপারটার জন্য ...”।

সে ভ্রু কুচকালো। এটা কি যন্ত্রনা ছিল? সম্প্রতি সে অনিদ্রা আর মাথা ব্যথার অভিযোগ করতে শুরু করেছে আর চশমার লেন্স গুলোও ক্ষীণদৃষ্টি শক্তির সাথে খাপ খাচ্ছে না। কিছু একটা ভেঙ্গে তার চোখে আঘাত লেগেছে:

"দেখ, আমি বলছি ভুলে যাও যা আমি বলেছি। তারা যা ভাবে ভাবুক, আমি কোন পরোয়া করি না। তার সাথে আমি বন্ধুত্ব করব এটা আমার ব্যাপার, তাই নয় কি?

আমি তার চোখে চোখ রাখলাম:

" ওদেরকে ফালতু কথা বলতে দেবে না। অথবা মুখের উপর শুনিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের চর্বিত-চর্বন আমাকে বলো না। "

"চল টেনিস খেলি," কিছুক্ষণ পরে সে বলল।

"আমি পারব না। শহরের শেষ প্রান্তের এক লোকের কাছ থেকে আমাকে একটু নেশার জিনিস সংগ্রহ করতে হবে," আমি বললাম।

"নেশা-দ্রব্য? তুমি নেশা কর ?"

"হ্যাঁ। লেবাননের বৈচিত্রময় নেশাদ্রব্য আমার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট উত্তেজক। "

সে সত্যই আহত হলো।

একটা কথাও না বলে সে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি তার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম এই আশা করে যে সে তার নীতি-শিক্ষকের মতো কথা বলবে না যিনি আসলে সেই ব্যক্তি যে তাকে পছন্দ করেন না। এবং ওটা এমনই ছিল। ওটা এমনই ছিল যতক্ষণ না সে তার কবজিতে সজোরে আঘাত করল। কিন্তু এর আর একটা দিক ছিলঃ যৌনতা।

অক্সফোর্ডে কালো মেয়েরা – তা তারা অফ্রিকীই হোক, ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান বা আমেরিকান-আমাদের ঘৃনা করে যারা রোডেশিয়া থেকে এসেছি। মোটের উপর, আমরা তো এখনও পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করিনি। উপরন্ত, পত্রিকাগুলো বলে যে, আমরা সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি। এরকম আরও অনেক কারণ যা মেয়েরা বিশ্বাস করতে পছন্দ করে। এসব অতিরঞ্জিত নয়। আমরা গিয়েছিলাম– অবশ্য হয়েও গেছি– আফ্রিকার ইহুদী, আর কেউ আমাদের চায় নি। এটি বেশ খারাপ যে সাদারা আমাদের ঘৃণা করে। কিন্তু এটা মাথা খারাপ করে দেয় যখন সমগোত্রীয় একজন অপর জনকে নাক উঁচু ভাবটা দেখায়... আর এটা তাকে শিখতে হয়েছিল।

আমি এভাবে বা ওভাবে-কোনটাকেই পরোয়া করতাম না। মদের নেশায় চুর হওয়া মেয়েদের চেয়ে, এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের চেয়ে ভালো। নেশাই স্বর্গ। কিন্তু সে উদ্বিগ্ন। একটা ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান মেয়ে যে রন্ধনশালায় কাজ করত তার ব্যাপারে সে সব প্যাঁচ লাগিয়ে ফেলেছে। যেমনটা আমি তাকে চিনি "নেমে এসো' কথাটি তাকে একেবারেই কম প্রভাবিত করে।

"কিন্তু আমরা সবাই কৃষ্ণাঙ্গ," সে গোঁ ধরে বলল।

প্রাতরাশের আগ পর্যন্ত আর একটা সুরা পান করা হয়েছিল।

“তুমি ন্যাশনাল ফ্রন্টের কোন জোচ্চোরকে বলতে পারো যে, আমরা সবাই মানুষ” আমি বললাম।

“সম্ভবত কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের জন্য যথেষ্ট ভালো নয়,” সে বাধা দিয়ে বলল। “সম্ভবত তারা সারাদিন স্বপ্ন দেখে যে সাদারা তাদের নাট বল্টু লাগিয়ে দেবে। হতে পারে .....”

“আমি শুনেছি যে, তুমি সারাদিন রন্ধনশালার আশে-পাশে ঘুর ঘুর কর। ” সে বসে পড়ল।

অবশেষে আমি একজন বন্ধুকে হারাতে চলেছি।

কিন্তু সে বেদনার্ত হৃদয়ে দীর্সশ্বাস ফেলল এবং প্রথম বারের মতো–আমি এর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম- সে হঠাৎ এক ঝটকা পার্থিব শপথবাণী উচ্চারণ করল।

“আজ থেকে শুধু সাদা মেয়েরা নতুবা অন্য কেউ নয়। ”

“ইতিমধ্যে তুমি তা করে দেখেছো,” আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। সে শক্ত করে তার চেয়ারের হাতলগুলো খামচে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়লো।

“তুমি পুরুষদের ট্রাই করছো না কেন?” গ্লাস পূনরায় ভরাতে ভরাতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে অপলক তাকিয়ে রইল।

থু থু ফেলল :

“তোমার ভেতরটা যে নোংরামিতে ভরা তা-কি তুমি জানো?”

“আমি অনেক আগেই তার সন্দেহ করেছি,” আগ্রহ হারিয়ে বললাম। কিন্তু শেষ চালটা দিলাম:

“অথবা শুধুই হস্ত মৈথুন। আমরা সবাই করি। ”

ক্ষেপে গিয়ে, গ্লাস আবার ভরালো।

আমরা নিরবে ভাবনার মধ্যে দীর্ঘ একটা ঘন্টা কাটালাম মদ পান করে।

“ওরা আমাকে শহরের বাইরে পাঠাতে যাচ্ছে,” আমি বললাম।

“কি?”

বিস্মিত হলে তাকে বেশ শোনায়।

“আমি যদি স্বেচ্ছা রোগী হয়ে ওয়ার্নফোর্ডে যেতে অস্বীকৃতি জানাই”, আরও বললাম।

“ওয়ার্নফোর্ড কি?”

“ মনোচিকিৎসা কেন্দ্র,” আমি বললাম। “ লাঞ্চের আগ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় আছে। হয় স্বেচ্ছা বন্দী অথবা দূরে প্রেরণ। ”

আমি তাকে ওয়ার্ডেনের রিপোর্ট ধরিয়ে দিলাম। সে এটা খুলল। শিস দিল। তার শিসের শব্দই আমাকে তার সবকিছু ক্ষমা করতে বাধ্য করল, তাকেও। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো?”

“দূরে পাঠানো হোক,”

“কিন্তু ....”

আমি বাধা দিলাম।

"আমি মনে করি। এটিই আমার জীবনের একমাত্র সিদ্ধান্ত যা সঠিক প্রমাণিত হবে।"

"তুমি কি ইংল্যান্ডে থেকে যাবে?"

"হ্যাঁ। "

"কেন আফ্রিকায় গিয়ে আমাদের গেরিলাদের সাথে যোগ দিচ্ছো না? তুমি সব সময় আমার চেয়েও বেশী সংস্কারবাদী আর এটা একটা নিতান্তই প্রত্যাশিত সুযোগ।

আমি হাই তুললাম।

"তোমার গ্লাস তো খালি," আমি বললাম। "কিন্তু ভালোভাবে তাকাও। আমার দিকে এবং আমার সম্বন্ধে সবকিছু জানো। তারপর তুমি বলো। তুমি নিবেদিত প্রাণ গেরিলা যোদ্ধা কি-না। "

সে তাকালো।

তার গ্লাস আবার ভরিয়ে দিলাম, আর যেহেতু সে আমায় নিরীক্ষণ করছিল তাই আরও একটা বোতল খুললাম।

সে জ্বলে উঠল; প্রায় দূরাভিসন্ধি নিয়েই।

"তুমি একটা ভবঘুরে," সে দৃঢ়তার সাথে বলল।

"তুমি ঠিক ঐ নিগ্রো ভবঘুরের মতো যে আরেক দিন আমাকে আক্রমণাত্মকভাবে সম্বোধন করেছিল। যখন আমরা ...."

"আমি জানি," ঢেকুর তুলে বললাম। সে অপলক তাকিয়ে রইল।

"তুমি কি করবে?"

"লিখব,"

"কিভাবে বাঁচবে?"

"আগামী কাল নিজেই সে তার কথা ভাববে। আমি আশা করি," আমি বললাম।

আর ওটাই ছিল শেষ বার যখন আমরা মদের আড্ডায় একে অপরের সাথে বাক্যালাপ করেছিলাম ছোট ছোট মুহুর্ত ধরে যতক্ষণ না স্বচ্ছ রূপালী সূর্যের আলো দীর্ঘ খোলা জানালা ঠেলে ভেতরে ঢোকে, আর তাকে চেয়ারে প্রশান্তির ঘুমের ঘোরে রেখে কলেজের শেষ প্রাতরাশের জন্য ছুটলাম।

(এই অনুবাদটি *নতুন এক মাত্রা* নামক ছোটকাগজের হেমন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৭ খৃস্টাব্দে)